Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'চিহ্ন' এবং 'ঝড় ও ঝরাপাতা'

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.7
Pages	123-146
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

‘চিহ্ন’ এবং ‘ঝড় ও ঝরাপাতা’

সৈয়দ আজিজুল হক

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮–১৯৭১) *ঝড় ও ঝরাপাতা* (নভেম্বর ১৯৪৬)[১] এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮–৫৬) *চিহ্ন* (জানুয়ারি ১৯৪৭) উপন্যাস সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। উপন্যাস–দুটির পটভূমি হিসেবে ক্রিয়াশীল ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে এবং ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্য রসিদ আলির দণ্ড মওকুফ ও মুক্তির দাবিতে কলকাতায় সংঘটিত জনবিদ্রোহের উত্তাল ঘটনাবলি। তারাশঙ্কর এবং মানিক উভয়ে তখন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে স্বনামখ্যাত। রাজপথের অভ্যুত্থানমূলক গণলড়াইকে কেন্দ্র করে উভয়েই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন টেকনিক অবলম্বন করেছেন। সমকালীন কলকাতার জীবন–আলোড়ন কিংবা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে উপন্যাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয়েরই ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা। তবু বাস্তব ঘটনাবৈচিত্র্যকে উপন্যাসের প্লটে রূপান্তরসাধন, গঠনবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, রসপরিণাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি উপন্যাসের মধ্যে ব্যবধান কম নয়। তবে দুজন ঔপন্যাসিকের সৃজনশক্তির ভিন্নতার চেয়েও তাঁদের পৃথক পৃথক জগৎ–বিশ্বাস, শ্রেণী–অবস্থান, রাজনৈতিক আদর্শ–সংযোগ এবং সর্বোপরি জীবনদর্শন এই তারতম্যের বড়ো কারণ।

ঝড় ও ঝরাপাতা উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৩য় (নভেম্বর ১৯৪৬)। ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় ১৩৫২ র ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি–মার্চ ১৯৪৬) থেকে ১৩৫৩র আষাঢ় (জুন–জুলাই ১৯৪৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে *চিহ্ন* উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯৪৭ এর জানুয়ারি (মাঘ ১৩৫৩)। এ–উপন্যাসও গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঠিক কখন প্রকাশ পায় সে–তথ্য অস্পষ্ট। ১৩৫৩র নববর্ষ সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯৪৬) একত্রে কিংবা ১৩৫৩ সালেই (১৯৪৬)

ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়— এমন তথ্য কেউ কেউ দিয়েছেন।[২] এ-থেকে *চিহ্ন* উপন্যাসের পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়কাল এপ্রিল ১৯৪৬ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৭এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ধারণা করা যায়। এই উভয় উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।' গ্রন্থাকারে প্রকাশ কিংবা পত্রিকায় প্রকাশ— এই উভয় দিক থেকে *ঝড়* ও *ঝরাপাতা* *চিহ্ন* উপন্যাস অপেক্ষা দুমাসের অগ্রগামী হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্ন* রচনার ব্যাপারে তারাশঙ্কর কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন— এমন ভাবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এ-কথা বলাই সঙ্গত যে, সমসাময়িক ঘটনা উভয়কে উপন্যাস রচনার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাঁরা উভয়েই সে-অনুযায়ী দ্রুত তাদের রচনাকার্য সম্পন্ন করেছেন।

চিহ্ন উপন্যাসের পটভূমি প্রধানত ১৯৪৫এর ২১-২৩ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে সংঘটিত ঘটনাবলি। অন্যদিকে *ঝড় ও ঝরাপাতার* পরিপ্রেক্ষিত পুরোপুরিভাবেই ১৯৪৬এর ১১-১৫ ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্য রসিদ আলি খাঁর দণ্ড মওকুফ ও মুক্তিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাবর্ত। সেদিক থেকে তারাশঙ্কর উপন্যাস রচনার জন্য ভাবনা ও পরিকল্পনা করার সময় পান নি একেবারেই। ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে ফেব্রুয়ারিতেই তিনি লেখা শুরু করেছেন। কিন্তু প্লটচিন্তার জন্য মানিক কিছু সময় পেয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

২. *চিহ্ন* উপন্যাসে সংঘটিত ঘটনাধারার সময়কাল মাত্র দুদিন। কলকাতার রাজপথে ছাত্রযুবকদের অবস্থান ধর্মঘট, অবস্থানরতদের ওপর পুলিসের লাঠিচার্জ, ঘোড়সওয়ার পুলিসের হামলা, গুলিবর্ষণ প্রভৃতি সত্ত্বেও তাদের অনড়তা, গুলিবিদ্ধ হয়ে বহু হতাহত হওয়া, হাসপাতালে আহতদের গ্রেপ্তার, জাতীয়তাবাদী নেতার গৃহপ্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশ অবস্থানকারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান, ট্রাম চলাচল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ ইত্যাদি ঘটনার পরদিন প্রতিবাদসভা, শোভাযাত্রা, ট্রাম-বাস ধর্মঘট, আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীস্তরের মানুষের একাত্মতা, পথচারীদের দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল সাফ করানোর জন্য সৈন্যদের প্রচেষ্টা এবং সবশেষে মানুষের বাধভাঙা ঢলের কাছে পুলিস-প্রশাসনের পিছু-হটার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। কলকাতার এই ঘটনা ছাড়া মন্বন্তরের সময় নিজ গ্রামে ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে একজন কলেজছাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি

এবং সমসাময়িকালে শাসক-প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো এক কৃষককন্যার সম্ভ্রমহানির উদ্যোগের বিরুদ্ধে কৃষকদের জোটবদ্ধ প্রয়াসের দুটি সংক্ষিপ্ত কাহিনীও উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

চিহ্ন উপন্যাসে বিবৃত এই ঘটনাবলির সঙ্গে ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় সংঘটিত ঘটনাবর্তের সাযুজ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ওই তিনদিনের মূল মূল ঘটনা নিম্নরূপ : ২১ নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলার মোড়ে ছাত্রদের মিছিল পুলিস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে রাতব্যাপী ছাত্ররা সেখানে অবস্থান ধর্মঘট করে। অবস্থানকারী ছাত্রদের ওপর পুলিসের লাঠিচার্জ, গুলি ও ঘোড়সওয়ার পুলিসের মাড়ানো প্রভৃতি সত্ত্বেও তাদের ধর্মঘট-অবস্থান অব্যাহত থাকে। গুলিতে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হয়। পুলিসের লাঠিতে থেঁতলে যায় দশবছর বয়সী একটি কিশোরের মাথা। গুলি হাতে বিদ্ধ হয়ে এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেলেও পুলিসের বিরুদ্ধে ইঁট নিয়ে আক্রমণোদ্যত হয় এক যুবক (*চিহ্ন* উপন্যাসে রসুল নামে এক কলেজ ছাত্রের ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার অনুরূপ ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে)। কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নাম করে কিরণবাবু ছাত্রদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পাঠালে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি শরৎচন্দ্র বসুর নিকট ছুটে গিয়ে ফিরে এসে জানান, তিনি আসবেন না (*চিহ্ন* উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী নেতা বসন্ত রায় নিজে না এসে সহকারী অমৃত মজুমদারকে দিয়ে ছাত্রদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পাঠানোর এবং ছাত্ররা সে-নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে তাকে সমাবেশস্থলে আনার জন্য আবার তার কাছে গিয়ে অমৃত মজুমদারের ব্যর্থ হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে)। ২২ নভেম্বর সমগ্র কলকাতার মানুষের ঢল যেন ভেঙে পড়ে ধর্মতলার মোড়ে। ট্রাম-বাস বন্ধ থাকে ইউনিয়নের নির্দেশে। তবু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। পুত্র অমিয়নাথ ও বন্ধু সুরেশ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র বসু সে-সভায় উপস্থিত হন এবং সকলকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন; কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। ধর্মতলা স্ট্রীটে আবার গুলির খবর শুনে সেখানে জনতার বাঁধভাঙা মিছিল ছুটে যায়। অপরদিক থেকেও মিছিল এগিয়ে এলে পুলিস বাধ্য হয়ে স্থানত্যাগ করে। এভাবে মিছিল-সমাবেশের জন্য নিষিদ্ধ লালদিঘির রাস্তা জনতার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ২৩ নভেম্বরও জনতার প্রতিবাদ-বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। সরকার বাধ্য হন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নায়কের দণ্ড মওকুফ করতে। তিনদিনে

কলকাতায় চোদ্দটি গুলিবর্ষণের ঘটনায় তেত্রিশজন প্রাণ হারায়। *চিহ্ন* উপন্যাসে দুটি মৃত্যুর (গণেশ ও জয়ন্ত) ঘটনা আছে।

সামনে তিনদলের (কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির) তিনটি পতাকা নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা কর্তৃক লালদিঘির মোড় অতিক্রমণের কিংবা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করার নির্দেশ অমান্য করায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পথচারীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *চিহ্ন* উপন্যাসে, তার সঙ্গে ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারি মাসে রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে সংঘটিত আন্দোলনের সাযুজ্যই অধিক। ২২ নভেম্বর ১৯৪৫এও বিরাট শোভাযাত্রা রাজপথ প্রকম্পিত করে এবং তাতে উপরিউক্ত তিনটি রাজনৈতিক দলের পতাকাও ছিল। তবে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬এ যে-শোভাযাত্রা বের হয় তা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল, নভেম্বরের চেয়ে ফেব্রুয়ারিতে তিন দলের ঐক্যের মনোভাবও ছিল স্পষ্ট— শোভাযাত্রায় যার প্রকাশ ঘটে। তিন দলের নেতারা ওই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন— এমনকি সে সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। *চিহ্ন* উপন্যাসে উল্লেখিত শোভাযাত্রার চিত্রে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত তিনদলের নেতৃত্বাধীন এই মিছিলের প্রতিফলনই অধিকতর স্পষ্ট। অন্যদিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক পথচারীদের দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করার ঘটনা পুরোপুরিভাবেই ১৯৪৬ সালের ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারির। এমনকি মানিক নিজে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬এ এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হলে সেনাবাহিনীর নির্দেশ অমান্য করে তাদের দ্বারা নিগৃহীত হন।[৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানিকের *চিহ্ন* উপন্যাস প্রধানত নভেম্বর ১৯৪৫এর ঘটনাকে পটভূমি করে রচিত হলেও এতে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬এর উত্তাল প্রসঙ্গগুলির আভাস ক্ষীণ হলেও আছে।

অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসটি একান্তভাবেই ১১-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬এর ঘটনা অবলম্বনে রচিত। দিন-তারিখের সুনির্দিষ্ট উল্লেখসহ বাস্তব ঘটনারাশির সঙ্গে পুরোপুরি সংগতি রেখে উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক, বিদেশি কোম্পানি অফিসের কেরানি, গোপেন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে দিনের কর্মশেষে রাত সাড়ে নটায় গৃহপ্রত্যাবর্তনের উদ্দেশে খিদিরপুর থেকে ডালহৌসি স্কোয়ারের ট্রাম-ডিপোতে এসে ট্রাম চলাচল বন্ধ দেখে ওইদিন ছাত্র শোভাযাত্রীদের ওপর পুলিসের নিপীড়নমূলক ঘটনার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। অতঃপর তার দৃষ্টিকোণ

থেকে উপস্থাপিত হয় পরবর্তী দিনগুলিতে সংগ্রামমুখর কলকাতার যুদ্ধদীপ্ত রাজপথের চিত্রসমষ্টি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের মতোই এ-উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে ডায়েরিরূপে ওই দিনগুলির ঘটনাবিবরণ। প্রতিদিনের মূল মূল ঘটনাচিত্রের সমান্তরাল পরিবেশনেই তা স্পষ্ট হবে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্য রসিদ আলি খাঁর দণ্ড মওকুফের দাবিতে কলকাতায় ওইদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস ও মুসলিম ছাত্রলীগের ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আগে ও পরে ছাত্র মিছিলে পুলিস লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার ও গুলিবর্ষণ করলে জনতাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর লরিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিসি নির্যাতনের প্রতিবাদে ট্রাম ও বাস চলাচল এবং দোকানপাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি পরের দিন যৌথভাবে হরতাল আহবানের সিদ্ধান্ত নিলেও পরে ওই কর্মসূচী স্থগিত রাখে।

উপন্যাসের বিবরণ : "১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাযাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পুলিশ দু'বার লাঠিচার্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ, রঙ দেখে আর চেনা যায় না।...জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ার। খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে।" (পৃ ২)। অন্যত্র, "স্টুডেন্টস প্রসেসনের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরি পুড়েছে, গুলি চলেছে। ট্রাফিক বন্ধ।" (পৃ ৩)। এরূপ পরিস্থিতিতে উপন্যাসের নায়ক গোপেনকে ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে হেঁটে শ্যামবাজার মোড়ে তার বস্তিঘেঁষা ভাড়াগৃহে ফিরতে রাত একটা বেজে যায়। পথে সে পুলিশের গুলিবর্ষণের বিপরীতে জনতার ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক হরতাল আহূত না হলেও বিক্ষুব্ধ জনতার বাধায় ট্রাম-বাস চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ অনুগত লোকদের মাথা থেকে টুপি ও গলার টাই খুলে ফেলে জনতা। ডাস্টবিন, কাঁটাতার, ইটপাথর প্রভৃতি জড়ো করে জনতা পুলিশ-চলাচলে বাধাসৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীর লরিতে অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে। দুপুরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে গুলিতে মনোরঞ্জন দত্ত নিহত হয়। দুপুর নাগাদ শহরে পঁচিশ

দফা গুলি চলে। দুপুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ সহস্র জনতার এই সমাবেশের পর এক বিশাল শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলের অগ্রভাগে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গুণদা মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ। দেখতে দেখতে শোভাযাত্রা লক্ষাধিক লোকের জনসমুদ্রে পরিণত হয়। মিছিলে পুলিশ লাটিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। গণেশ অ্যাভিনিউর কাছে কাঁদানে গ্যাসে বিব্রত জনতাকে জল ঢেলে সাহায্য করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেমসাহেবরা। বিকালে কলকাতার অবস্থা ভীষণ রূপ ধারণ করে। ১১ ফেব্রুয়ারি গুলিতে আহত নাজিমুদ্দিন ওইদিন মারা গেলে তার লাশ নিয়ে পঞ্চাশ হাজার লোকের মিছিল রাজপথে বের হয়। কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। যাবতীয় বস্তি উজাড় করে সব মানুষ রাজপথে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় আট। হতাহতের অধিকাংশই শহরের নিচুতলার বাসিন্দা।

উপন্যাসের বিবরণ : ইউনিয়নের ধর্মঘট আহবানের ফলে ট্রাম-বাস-রিকশা-দোকানপাট বন্ধ। গোপেন হেঁটে অফিসের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু অফিসে তার যাওয়া হয় না। রাজপথের পরিস্থিতি সারাদিন তাকে জনতার লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবিত্ত কিশোরদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার ঘটে। নিজ নিজ গাড়িতে চড়ে বেড়ানো লোকদের থামিয়ে জনতা তাদের হাঁটতে এবং সাহেবী পোষাকের চিহ্ন পরিবর্তনে বাধ্য করে। কংগ্রেস-পতাকাবাহী গাড়ি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের আহবান জানায় এবং ভদ্রলোকদের লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধারের প্রয়াস পায়। 'বন্দে মাতরম', 'জয় হিন্দ,' 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'হিন্দু-মুসলমান এক হোক', 'রসিদ আলিসহ রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি ধ্বনিতে রাজপথ প্রকম্পিত হয়। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কিশোর মনোরঞ্জন দত্ত। ডালহৌসি স্কোয়ারে লক্ষ জনতার সমাবেশ , অতঃপর মিছিল, মিছিলে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসনিক্ষেপের পর শোভাযাত্রীদের সাহায্যার্থে পথিপার্শ্বস্থ দোতলা-তিনতলা বাড়ির ওপর থেকে মেয়েদের জল ঢেলে সাহায্যদান প্রভৃতি ঘটনাশেষে রাজপথ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের গাড়ি জনতাকে

শান্ত থাকার পরামর্শ দিতে গেলে জনতা ওই গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কালীঘাট ট্রামডিপোয় অগ্নিসংযোগ করে জনতা। এই অগ্নিসংযোগের ঘটনায়ও গোপেন ছিল এবং ওইখানেই সে আহত হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। কলকাতায় ওইদিন থেকে কায়েম হয় সেনা-রাজত্ব। অন্যদিকে কলকাতা পরিণত হয় নিরস্ত্র জনগণ ও সৈন্য-পুলিশের মধ্যেকার এক অসম যুদ্ধক্ষেত্রে। শহরের বিশটি স্থানে ব্যাপক গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সমগ্র দিন এবং রাতেও চারদিকে কেবল গুলির শব্দ। গুলিবিদ্ধ হয় প্রায় দুশো লোক। নিহতের সংখ্যা পনের অতিক্রম করে যায়। তবু জনতাকে স্তব্ধ করা সম্ভবপর হয় না। শহরের সকল কিশোর যেন ওইদিন রাজপথে নেমে আসে— তারাই থাকে সবকিছুর সামনে। বস্তির কিশোর-বালকেরা সেনাবাহিনী ও পুলিসের লরিতে ইষ্টক নিক্ষেপ করে দ্রুত গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। একঝাঁক গুলি এসে ঝাঝরা করে দেয় চোদ্দ বছরের কিশোর আজমিরির (দুধওয়ালার পুত্র) বুক। ঠেলাগাড়ি, প্যাকিং বাক্স, ডাস্টবিন দিয়ে সৈন্য-পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে জনতা। সৈন্যরা বিনা অপরাধে বিভিন্ন গৃহে প্রবেশ করে; নিরীহ নারী-পুরুষদের লাঞ্ছিত করে; বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকান লুট করে। নিরীহ পথচারীদের ধরে সৈন্যরা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করায়।

উপন্যাসে ওইদিনের কাহিনী নিম্নরূপ : "রাস্তাঘাট যেন তেপান্তরের মাঠ,— ট্রাম নেই, বাস নেই, গাড়ি-ঘোড়া, রিক্সা— কিছুই নেই; মিলিটারি লরি— যেগুলো পাড়া কাঁপিয়ে সকালবেলা কারখানার বাবুদের, ফিরিঙ্গী মেমসায়েবদের আনতে যায়, সেগুলো পর্যন্ত আজ বন্ধ। মোড়ের উপর বন্দুক ঘাড়ে করে লালমুখোরা টহল দিচ্ছে। বাজারহাট, দোকানপাট সব বন্ধ।" (পৃ ২০)। সমগ্র শহর জুড়ে সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে জনতার, বিশেষত কিশোর-যুবকদের, লড়াই। যার অধিকাংশই আবার বস্তির কিশোর-তরুণ। গোপেনের দশ-বারো বছরের দুই পুত্র এই রাজপথ-যুদ্ধে— অর্থাৎ গুলির বিরুদ্ধে ইষ্টকবর্ষণের লড়াইয়ে— সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অতিবাহিত করে। গোপেনের চোদ্দ বছরের কন্যাও রাজপথ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং গুলির আঘাতে নিহত হয়। পুত্রদের খোঁজে বেরিয়ে গোপেন পূর্বদিনের মতো লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে বাসায় ফেরে গভীর রাতে। গুলির বিরুদ্ধে ঢিল ছোঁড়ার এই অসম যুদ্ধে জনতার সঙ্গে পেরে ওঠে না সৈন্য-পুলিশ। তাই রাতে তারা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। একদিকে প্রশাসনের তীব্র দমননীতি— দেখামাত্র

গুলির নির্দেশ, অন্যদিকে সকাল থেকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী দল কর্তৃক জনতার প্রতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আবেদন ঘোষিত হয়। গুলিতে হতাহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য তিনদলের নেতাদের নিয়ে ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। সরকারি পীড়ন ও রাজনৈতিক দলগুলির শান্তিনীতির ফলে কলকাতার জনরোষ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে ওইদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেশকিছু কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। আন্দোলন বিস্তার লাভ করে কলকাতার বাইরে।

উপন্যাসের কাহিনীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকাবাহী গাড়ির কথা উল্লেখ আছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারির মধ্যে চারজনের অধিক লোকের একত্র যাতায়াতবেআইনি— সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি ওই গাড়ি থেকে জনতার উদ্দেশে বলা হয় : "কংগ্রেস ও লীগের কর্তৃপক্ষ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন— আপনারা এই ধরনের উন্মত্ততা থেকে ক্ষান্ত হোন। এতে আমাদের ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে।" (পৃ৪৪)। অতঃপর কলকাতা শান্ত হয়ে পড়ে। তবে আন্দোলন বিস্তৃত হয় শহরতলী ও মফস্বলে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। বিভিন্ন জেলা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লেও কলকাতা আরও শান্ত হয়ে যায়। উপন্যাসে— কন্যাহারা, গুলিতে আহত, গোপেন পথে বেরিয়ে দেখতে পায় : দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। দু'চারজন মানুষ যারা চলছে, তাদের মাথা নত হয়ে আছে। রাস্তার লাইট পোস্টে সাঁটা কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর 'জনগণের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক পোস্টারে উত্তেজনার কারণ ঘটলেও শান্ত থাকার এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না-হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর দর্পপূর্ণ টইল ছাড়া নিভে গেছে সকল প্রতিরোধের আগুন। বস্তিঘেঁষা পাড়ার কানু আহতদের রক্ত দিয়ে সাহায্য করার জন্য হাসপাতালে যায়। পরদিন অফিসগমনের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পরপরই খেয়ে শুয়ে পড়ে গোপেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। গত পাঁচদিনের উত্তাল প্রতিরোধ সংগ্রামের চিহ্নসকল মুছে দিয়ে কলকাতায় শুরু হয় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। উপন্যাসের নায়ক গোপেন তিনদিন অফিসকামাইয়ের পর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে অফিসে উপস্থিত হয়। মিথ্যা অজুহাত দিয়ে সাহেবের কাছ থেকে সাতদিনের ছুটি ও বিশ টাকার চিকিৎসা-সাহায্য লাভ করে অপ্রত্যাশিতভাবে।

ঝড় ও ঝরাপাতার কাহিনী এভাবে ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা নগরীর উত্তাল দিনগুলির ঘটনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। নায়ক চরিত্র গোপেন এবং তার পরিবারকে কল্পনা সহযোগে সৃষ্টি করে কাহিনীর সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সবই বাস্তব ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ মাত্র।

চিহ্ন উপন্যাসে প্রধানত ১৯৪৫এর নভেম্বর-আন্দোলন প্রতিভাত হয়ে উঠলেও অনুমান করতে কষ্ট হয় না, উপন্যাসটি রচনার সময়ে পরবর্তী ফেব্রুয়ারি আন্দোলনও মানিকের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ছিল। অন্যদিকে মূলত ফেব্রুয়ারি-আন্দোলনকে ভিত্তি করে *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাস রচিত হলেও বারবার সেখানে স্মৃতি হিসেবে উল্লেখিত হয় নভেম্বর-সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি। তাই বলা যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্যদের দণ্ড মওকুফ ও মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারির এই উভয় প্রতিবাদ-বিদ্রোহই আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ের ভিত্তিপ্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ঘৃণা ক্ষোভ ও রোষের যে-তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই উভয় পর্বে সেটাই দুই শিল্পীকে উপন্যাসরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, সন্দেহ নেই।

৩. তবে বিষয়বস্তুর এই অভিন্নতা সত্ত্বেও উপন্যাস দুটি কাঠামোগত সৌকর্যে ভিন্নতা লাভ করেছে। কারণ, প্রায় একই বাস্তব ঘটনা দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তব সত্যকে শিল্পসত্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে যে-কল্পনাশক্তি ও প্রকল্পজ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে তার অভাব অনেকটা লক্ষণীয়। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের প্লটে রূপান্তরিত করার এই শৈল্পিক প্রয়াস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অন্যদিকে তারাশঙ্করের সততা ও দক্ষতা বাস্তব অভিজ্ঞতার নিপুণ চিত্রায়ণেই সীমাবদ্ধ।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বাস্তববাদী লেখককেও কল্পনার দ্বারস্থ হতে হয়। বস্তুনির্ভরতা ও বস্তুসর্বস্বতা অবশ্যই সমার্থক নয়। বাস্তব জগতে যা ঘটে তা মানুষ বিশ্বাস করবে কি করবে না এ-নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা নেই কিংবা সত্য হয়ে-ওঠার ব্যাপারে তার কোনো আন্তর-গরজও নেই। কিন্তু শিল্পী যা সৃষ্টি করেন তাকে সত্য করে তুলতে হয়। সে-কারণে বাস্তববাদী শিল্পীকেও হতে হয়

কল্পনারসিক। তবে রোমান্টিক শিল্পীর কল্পনানির্ভরতার সঙ্গে বাস্তববাদী লেখকের নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। উভয়েই বাস্তব পৃথিবীর ওপর পা রেখে কল্পনার ডানা ওড়ান আকাশে— কিন্তু পার্থক্য হলো : বাস্তববাদী শিল্পীর কল্পনার ডানায় থাকে কেবল মাটিরই টান, অন্যদিকে রোমান্টিক রচয়িতার কল্পনার পাখায় শুধু নীল আকাশের স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে। তারাশঙ্কর ও মানিক উভয়েই বাস্তববাদী লেখক। কিন্তু মানিকের মধ্যে কল্পনার যে-সমৃদ্ধি আমরা *চিহ্ন* উপন্যাস প্রসঙ্গে লক্ষ করি, *ঝড় ও ঝরাপাতার* লেখক হিসেবে তারাশঙ্করের মধ্যে ততোধিক বস্তুসর্বস্বতা দৃষ্টিগ্রাহ্য। এ-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বস্তুবিভোরতা সত্ত্বেও ব্যাপক ভাবাবেগতাড়না *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসকে পুরোপুরিভাবে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু *চিহ্ন* উপন্যাসে আবেগের যে-স্ফূর্তি তা বুদ্ধির সংযমশৃঙ্খলে বাঁধা।

উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার প্রশ্নেও দুজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসের কাহিনী ছদিন সময়-পরিসরে ব্যাপ্ত। উপন্যাসে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে ডায়েরির মতো— পরপর তারিখ সাজিয়ে এবং সুস্পষ্টভাবে। তাছাড়া পত্রিকার সংবাদ হুবহু উদ্ধৃত করে বাস্তবতার সাক্ষ্যকে আরও দৃঢ় করা হয়েছে। অন্যদিকে *চিহ্ন* উপন্যাসের ঘটনাকাল দুদিনেরও কম। একদিন দুপুর থেকে পরদিন দুপুর— এই চব্বিশঘন্টার মধ্যে কাহিনী বিস্তৃত। উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুধরনের নিয়ম প্রচলিত আছে— চরিত্রের আভ্যন্তর পরিবর্তনের চিহ্নগুলি স্পষ্ট করে কিংবা প্রহর-দিন-মাস-বছরের সীমা-উল্লেখের মাধ্যমে। মানিক তাঁর উপন্যাসে এই উভয় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে। তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক রীতির দ্বারস্থ হন নি।

গঠনবিন্যাসের আলোচনায় কাহিনীগতির প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। স্মরণীয় যে, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বড়ো ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, তখন পরিবর্তনগুলোও আসে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ইতিহাসের ওইসব বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত পরিবর্তনের ধারাসমূহ উপন্যাসে ভাষারূপ দিতে গেলে কাহিনীতে দ্রুতগতি সঞ্চার আবশ্যক হয়ে পড়ে। *রাজসিংহ* উপন্যাস-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এখানে স্মরণযোগ্য : "রাজসিংহ' প্রথম হইতে উলটাইয়া গেলে এই কথাটি বারংবার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের

দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।"[৪] মানিকের *চিহ্ন* উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায়-অনুরূপ দ্রুততা, কাহিনীগতি ও অনাবশ্যক উপাদান-বর্জনের প্রয়াস লক্ষ করি। রাজপথের একটি সাহসী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণীস্তরের মানুষ কিভাবে ওই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়, দ্রুততালে কিভাবে তাদের মনের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে— উপন্যাসে তা চিত্রময় করে তোলার জন্য দ্রুতগতি সৃষ্টির বিকল্প ছিল না। উপন্যাসের বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে কাহিনীবিন্যাসের সামঞ্জস্যবিধানের জন্যও তা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে এইরূপ গতিসৃষ্টিতে পুরোপুরি সমর্থ হন নি। উদ্দীষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনাবিন্যাসের সাযুজ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও তার সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। তাঁর নায়ক-চরিত্র পায়ে হেঁটে যেমন রাজপথের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখে তেমনি উপন্যাসের কাহিনীও যেন অনুরূপ পদব্রজে শ্লথগতিতে অগ্রসর হয়। প্রবল ঘটনাবর্তের মধ্যে তিনি নানা চরিত্রের চিন্তাস্রোতকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করেছেন তাতে তাঁর কাহিনী বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এ-প্রসঙ্গে আমরা উপন্যাসের শিল্পরূপ-সম্পর্কিত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন, "...ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড়ো বিষয় হল জীবনের সমগ্রতার সন্ধান।...এই সন্ধানের সার্থকতর রূপ তখনই সৃজন করা যায়, যখন উপন্যাসকারের নির্ভীক নিরাসক্তি জীবন সন্ধানে লেখককে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করে তোলে...এ নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিন্তু বাস্তবের স্থূল অতি বর্ণনা নয়।...সামগ্রিকতা মানে totality of objects এবং totality of objects মানে cataloguing of details নয়; নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এইটা প্রধান কথা।"[৫] উপন্যাসের শিল্পসার্থকতার জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে জীবনের সামগ্রিকতা সন্ধানের এই মানদণ্ডেই আমরা আলোচ্য উপন্যাস দুটির পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি। totality of objects সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসে *চিহ্ন* উপন্যাস যেখানে সার্থক, *ঝড় ও ঝরাপাতা* সেখানে cataloguing of details-এর সমাহার হয়ে উঠেছে। 'বাস্তবের স্থূল অতি বর্ণনা' বা 'লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী'— এই সব অভিযোগই *ঝড় ও ঝরাপাতার*

বিরুদ্ধে উঠতে পারে। মানিক কোনো একটি পরিবার বা ব্যক্তিকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেন নি; বরং নানা টুকরো টুকরো ছবির মালা গেঁথে তিনি কাহিনীকে এবং তাঁর জীবনবোধ-সম্পর্কিত উচ্চারণকে সম্পূর্ণতাদান করেছেন। ফলে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের দুঃখ-যন্ত্রণা, তাঁর উপন্যাসে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ না-থেকে তা সমষ্টির হাহাকারে পরিণত হতে পেরেছে। অন্যদিকে তারাশঙ্করের উপন্যাসে একটি সম্পূর্ণ পরিবারই অর্জন করেছে প্রাধান্য। তবু সেখানে পরিবারের মৃত্যুজনিত বেদনা পরিবার-সীমা অতিক্রম করতে পারে না। তারাশঙ্করের জীবনভাবনাগত সামগ্রিকতার অভাবই এর কারণ। আসলে উপন্যাসে জীবনের সমগ্রতাস্পন্দী রূপসৃজনের বিষয়টি কেবল লেখকের শিল্পশক্তির সঙ্গে জড়িত নয়, তার সামগ্রিক জীবনোপলব্ধির সঙ্গেই রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। সে-কারণে জীবন ও জীবনের বাস্তবতার বিন্যাস বা মায়াসৃষ্টির প্রশ্নটি এখানে প্রাসঙ্গিক। আর সেই সঙ্গে জড়িত লেখকের সংযমবোধ বা আহৃত অভিজ্ঞতার কোন কোন অংশ লেখক গ্রহণ বা বর্জন করবেন— সেই মাত্রাচেতনার বিষয়টিও। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এসবের অভাব আমাদের পীড়িত করে।

তবে এ-অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হবে— এমন আশা না-করাই ভালো। এবং সে জন্য স্মরণযোগ্য হীরেন মুখোপাধ্যায়ের ভিন্নমত : "ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারি শুধু সেদিনের উন্মাদনার চেহারা আঁকতে— তবে পাঠককে বলব, সংগ্রহ করে পড়ুন মানিকবাবুর লেখা *চিহ্ন,* যাতে রয়েছে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিনের অবিস্মরণীয় ছবি, আর তারাশঙ্করবাবুর *ঝড় ও ঝরাপাতা,* যা হল ফেব্রুয়ারি দিনগুলির প্রতিকৃতি— যে বলে বলুক লেখাটা ফোটোগ্রাফের ধরনে আর তাই নাকতোলা বিচারে মহৎ শিল্প বুঝি নয়, কিন্তু যখন গণজাগরণ বিপ্লবের আকার নিতে চাইছে তখন তার অবিকল বর্ণনাতেই ফুটে ওঠে সৃষ্টিশীল শিল্পের প্রতিটি উপলক্ষণ।"[৬] বোঝাই যায়, এ-মন্তব্য যতটা আবেগনির্ভর, বিশ্লেষণনির্ভর ততটা নয়। তবে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন, "তিনি যে নাগরিক লেখক নন, গ্রাম-জনপদের লেখক, তাঁর দীর্ঘ রচনাতালিকাতেই তা প্রমাণিত হয়। 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬) শিল্পসৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ, কারণ তারাশঙ্করের মনোযোগ তাতে আছে, অন্তরের যোগ নেই।"[৭]

৪. একই কথা প্রযোজ্য চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে। শিল্পগত মান বিবেচনায় উপন্যাসে

চরিত্র সৃষ্টির প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন–সম্পর্কিত ব্যাখার প্রকাশ ঘটে চরিত্রসমূহের সার্থক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। সে–কারণে একটি শিল্পসফল উপন্যাসের সঙ্গে সার্থক চরিত্রসৃজনের প্রসঙ্গটি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। উপন্যাসের সমগ্র ন্যায়শৃঙ্খলার ভিত্তিতেই একটি চরিত্রকে গড়ে তুলতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে চরিত্রের আচার–আচরণ খাপছাড়া হতে বাধ্য।

চিহ্ন উপন্যাসে অনেকগুলো পরিবারের চিত্র–অঙ্কনসূত্রে বহু চরিত্রকে পরিস্ফূটিত করা হয়েছে। কোনো কোনো চরিত্র এসেছে অতি অল্পসময়ের জন্য; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, প্রতিটি চরিত্রের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে অতিশয় যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে উন্মোচন করা হয়েছে। সকল চরিত্রকেই উপস্থাপন করা হয়েছে উপন্যাসের পরিণামী ব্যঞ্জনার সঙ্গে একাত্ম করে। প্রতিটি চরিত্রের আচার–আচরণ কিংবা তাদের আভ্যন্তর পরিবর্তনের সূত্রগুলো পূর্বাপর যুক্তি পরম্পরায় গ্রথিত। নিত্যদিনের অভ্যাস সত্ত্বেও অক্ষয় কেন ওই রাতে মদের দোকানের সামনে গিয়েও ফিরে আসে, সংসারের দায়িত্ব অসময়ে কাঁধে এসে পড়ায় ছাত্রজীবন ছেড়ে কেরানি চাকরিতে প্রবেশকারী অজয় কিভাবে সব ভুলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্ম হয় এবং পরদিন চাকরিচ্যুতির ভয় নিয়েও অফিস কামাই করে, সংসার দায়িত্বের কথা ভেবে সর্বদা সভা–মিছিল উপেক্ষাকারী হেমন্ত কিভাবে ওইসবে অংশগ্রহণ করে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিনও প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়, হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কেন মৃত্যুবরণ করে অরুণা মজুমদার— এ-সবকিছুর ব্যাখ্যা উপন্যাসে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনো চরিত্রের আচরণগত অসংগতি আমাদের পীড়া দেয় না।

স্মরণীয় যে, সমাজ–সভ্যতা নদীর মতোই প্রবহমান, সদা পরিবর্তনশীল। এই প্রবহমান স্রোতে ব্যক্তিমানসও অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় দ্বন্দ্বমূলক। সমাজ–সভ্যতার পরিবর্তনশীল অগ্রসরযাত্রা যেমন ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবিত করে, তেমনি ব্যক্তিমানুষের কর্মযজ্ঞ, চিন্তাসূত্রও সমাজরূপান্তর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দৃষ্টিসীমার অগোচরে প্রতিনিয়ত এই দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের বিচিত্র ও নিবিড় সংযোগক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের বড়ো ধরনের ক্রান্তিকাল যখন উপস্থিত হয়, তখনই সমাজ ও ব্যক্তির এই দ্বন্দ্বমূলক পরিবর্তন-রেখাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। *চিহ্ন* উপন্যাস রচনাকালে মানিকের মধ্যে এই সচেতন বোধ ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে তিনি এ–উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিমন ও সমাজসংকটের দ্বন্দ্ব এবং

তার মধ্য দিয়ে উভয়ের রূপান্তরগতিকে সুস্পষ্ট করে। বলতে দ্বিধা নেই, তারাশঙ্করের মধ্যে অনুরূপ সচেতন উপলব্ধির অভাব ছিল। অন্তত *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসের চরিত্রবিশ্লেষণকালে এ-কথা আমাদের মনে জাগে।

ঝড় ও ঝরাপাতা উপন্যাসে চরিত্রসংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্বল্প। যে-কয়টি চরিত্রকে তারাশঙ্কর কিছুটা সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন, তার সংখ্যা আরও অল্প। বিদেশী সওদাগরি অফিসের আধা-কেরানি গোপেন, তার স্ত্রী শান্তি, চতুর্দশ বছরের কন্যা নেবু ও প্রতিবেশী কানু— এই চারটি চরিত্রকে মোটামুটিভাবে পরিস্ফুটিত করার চেষ্টা লেখক করেছেন। গোপেন, তার দুইপুত্র দেবা-ট্যাবা ও নেবু-কানু ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে সক্রিয় হলে এবং পরিণামে গোপেন গুলিবিদ্ধ ও নেবু নিহত হলে স্ত্রী ও মা হিসেবে শান্তির মধ্যে যে-যন্ত্রণা ও দহন, তারই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। মূলত বস্তিসংলগ্ন একটি পরিবার এই আন্দোলনের সঙ্গে কিরূপ সংযুক্ত হলো এবং তার পরিণামে কি ক্ষতির সম্মুখীন হলো— সেটা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। হয়ত এর মধ্য দিয়ে লেখক এমন শত পরিবারের সংযুক্তি, হতাহত হওয়া এবং যন্ত্রণালাভের বিষয়টিকেও রূপকায়িত করতে চেয়েছেন। আর এমন একটি পরিবারকে বেছে নেয়ার কারণও হয়ত— ওই আন্দোলনে কলকাতার বস্তি পরিবারগুলিরই ছিল যে-মুখ্য ভূমিকা— সেই বাস্তবতাকে স্বীকৃতিদান। বাস্তবেও হয়ত এমনটাই ঘটেছে। আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত হয়ত এভাবেই বালক-কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকলকে নিশ্চিন্ত-নির্ভীকচিত্তে রাজপথে মৃত্যুর মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু বাস্তবের এমন শত-সহস্র চরিত্রের মধ্য থেকে গুটিকতককে যখন একজন ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে নির্বাচন করেন তখন পাঠকের জানার এ-অধিকার জন্মায় যে, রাজপথের সংগ্রামমুখর বহির্বিষয়ক কারণ ছাড়া কোন আভ্যন্তর প্রেরণা ওইসব চরিত্রকে গৃহসীমার বাইরে নিয়ে এল এবং একেবারে সৈন্য-পুলিসের তাক করা রাইফেলের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। দুর্ভাগ্য যে, এ-উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেও পাঠকের এ-কৌতূহল কোনোভাবে নিবৃত্ত হয় না।

এমনকি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোপেনের কথা যদি ধরি, তাহলেও পাঠকের অধিকার ক্ষুণ্নই থেকে যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬এর ছাত্র-শোভাযাত্রা, তাতে পুলিসের হামলা ও নির্যাতন এসবের কিছুই জানত না গোপেন। প্রতিদিনের মতো চাকরিশেষে রাত সাড়ে নটায় বাড়ি ফেরার জন্য ট্রাম ডিপোতে এসে ট্রামের

অচলতা দেখে সে সবকিছু অবহিত হয়। তারপর এক থমথমে ও ভয়ার্ত পরিবেশের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ও গলি ভেদ করে ঘরে ফিরতে তার বেজে যায় রাত একটা। বাস-ট্রাম বন্ধ থাকায় পরদিন যথারীতি সে হেঁটে অফিসের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু পথের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার আঘাতে অফিসের কথা ভুলে পথসংগ্রামে অংশীভূত হয়ে যায় গোপেন। সারাদিন সে পুলিসের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ট্রামডিপোতে আগুন ধরাতে গিয়ে আহত হয়ে রাতের শেষপ্রহরে ঘরে ফেরে। পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি আহত অবস্থায়ই পুত্রদের খোঁজে বেরিয়ে সে তাদের কথা ভুলে পুনরায় সৈন্য-পুলিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। একসময় পুলিস সার্জেন্টকে আঘাত করে নিজেও হয় গুলিবিদ্ধ। বাড়ি ফিরতে ওইদিনও তার রাত দশটা অতিক্রম করে যায়। তারপর দুদিন তার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবপর হয় না। কলকাতা শান্ত হয়ে এলে ১৬ ফেব্রুয়ারি যথারীতি সে অফিসে যায়। বাস্তবজীবনে এ-সবকিছু হয়ত সম্ভবপর। কিন্তু পাঁচ সন্তানসহ সাতসদস্যবিশিষ্ট পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব যার একার কাঁধে, তার পক্ষে অকস্মাৎ এমন মৃত্যুপণ লড়াইযজ্ঞের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর অন্তর্গত প্রেরণাউৎস গোপেনের জীবনে কোথায়— তা ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিতে সংসারের দায়িত্ব, চাকরিচ্যুতি ও মৃত্যুভয় প্রভৃতি নিয়ে গোপেনের দ্বন্দ্বাক্রান্ত হওয়াও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তারাশঙ্কর এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন অনেকটা দ্বন্দ্বহীন পরিবেশে। এ-কারণে ১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) অফিসের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগকালে গোপেনের মধ্যে একাধিকবার যে মৃত্যুচিন্তা প্রত্যক্ষ করি, তা-ও তাৎপর্য হারিয়েছে। কেননা তার পরবর্তী আচরণ বা পরিণামের সঙ্গে এই চিন্তার কোনো কার্যকরণশৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় না।

পাশাপাশি *চিহ্ন* উপন্যাসের একটি চরিত্রের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। কেরানি অজয়— পিতার যুদ্ধজনিত চাকরিচ্যুতির ফলে ছাত্রজীবন ছেড়ে অকালে তাকে সংসারদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে তার মধ্যে কর্তব্যবোধ, নিজ দারিদ্র্যজীবনের প্রতি অভিমান ও ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সংকোচ— এই সবকিছু একযোগে ক্রিয়াশীল। এ-কারণে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটকে প্রথমে সে দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে। কেননা কাছে ঘেঁষার সাহস ও শক্তি হারালেও কী ঘটে শেষ পর্যন্ত তা দেখার কৌতূহল সে হারায় নি। আর এমন সময় পুলিশের গুলি যখন ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকে ধর্মঘটকারীদের

পাঁজর, তখন সে সবকিছু বিস্মৃত হয়— দায়িত্বচেতনা, চিত্তজ্বালা কিংবা অন্যবিধ সংশয়— সবকিছু ভুলে সে সবার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সহানুভূতির স্রোত এভাবে তাকে রণভূমিতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। পরদিন চাকরিচ্যুতির ভয় সত্ত্বেও নিঃসংশয়চিত্তে সে অফিসের পরিবর্তে প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ মানিক অজয়-চরত্রিটির চিত্তদ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সুস্পষ্টরূপে। এমনকি ব্যাখ্যা করেছেন তার সংগ্রামে সংযুক্তির অতীত পটভূমিও। এভাবে মানিকের হাতে প্রতিটি চরিত্র বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার সমন্বয়ে পূর্ণায়ত রূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে তারাশঙ্করের মধ্যে আমরা লক্ষ করি বহির্বাস্তবতারই প্রাধান্য। অন্তর্বাস্তবতার রূপচিত্রণের অভাবে লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে তার চরিত্রগুলির অসম্পূর্ণ বিকাশ।

চরিত্র-নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষযোগ্য। *চিহ্ন* উপন্যাসে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী— এই সকল শ্রেণীস্তরের চরিত্রের সমাহার ঘটিয়ে একটি আন্দোলনের ব্যাপকতাকে সমগ্রতাস্পন্দী করে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে *ঝড় ও ঝরাপাতায়* বস্তিঘেঁষা নিচুতলার মানুষেরই ঘটেছে প্রাধান্য। ফলে রাজপথের আন্দোলন কেবল রাজপথেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, সমগ্র কলকাতার আলোড়নকে তা ধারণ করতে সক্ষম হয় নি। এর সঙ্গে নির্মাণগত অপূর্ণতা দোষ যুক্ত হওয়ায় তারাশঙ্করের চরিত্র-চিত্রণ কৌশলও সমর্থ হয় নি সামগ্রিকতা অর্জনে। আসলে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক বিশ্বাস বা জীবনদৃষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই সীমাবদ্ধতার বীজ।

৫. রাজনৈতিক আদর্শসংযুক্তির প্রশ্নে তারাশঙ্কর ও মানিকের সম্পর্ক মেরুদূর ব্যবধানের না-হলেও খুব নিকটবর্তীও ছিল না। জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুসারী ছিলেন তারাশঙ্কর, অন্যদিকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানিক ছিলেন শোষিত শ্রমজীবীর প্রতিই সহানুভূতিশীল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের সঙ্গে ছিলো তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ সংস্রব, আর মানিক ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির পার্থক্যই দুজনকে দুটি রাজনৈতিক দলে সংযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল— সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আবার এই সংশ্লিষ্টিসূত্রে দুজনের মধ্যে মূল্যবোধগত ব্যবধানও বেড়েছিল, সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে উভয় দলের সমান আগ্রহ থাকলেও ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে উভয়ের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। ঔপনিবেশিক

ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি নমনীয় মনোভাবের জন্য এ-শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের সমালোচক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। অথচ চল্লিশের দশকের শুরুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি তার আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতির ফলে বিপরীত সমালোচনার শিকার হয়। ১৯৪২এর আগস্টে 'ভারত ছাড়' নীতিগ্রহণ করে কংগ্রেস যখন ব্যাপক নির্যাতনের সম্মুখীন, ঠিক তখন কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ আট বছরের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকাশ্য তৎপরতার সুযোগ লাভ করে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে হয়ে ওঠে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশেষে পুনরায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেস স্বাধীনতার আশ্বাসলাভ করে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি সকল প্রকার বিরূপ আচরণ পরিহারে যখন সচেষ্ট, তখন কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে দ্বিধাশূন্য মানসের পরিচয় দেয়। ১৯৪৫এর আগস্ট থেকে ১৯৪৭এর আগস্ট পর্যন্ত দুবছর সময়কালে কংগ্রেস ব্রিটিশ-বিরোধিতা থেকে নিজেদের এমনভাবে গুটিয়ে রাখে যে, ওই সময়ে সংঘটিত সব ধরনের জন-অসন্তোষকে শান্ত থাকার পরামর্শদানের নামে মূলত তারা ওইসবের পরোক্ষ বিরোধিতাই করে। আর সেই সুযোগে ব্রিটিশ শাসকশক্তি এদেশের জনবিদ্রোহ দমনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে সক্ষম হয়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ১৯৪৬এর নৌবিদ্রোহের ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টি নানা দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যেও গণআন্দোলনের পক্ষেই ভূমিকা নেয়; কিন্তু নিজেদের ক্ষুদ্র সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুই দলের এই দ্বিবিধ মানসিকতার প্রতিফলনই আমরা তারাশঙ্কর ও মানিকের সূত্রে আলোচ্য দুই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি।

জাতীয়তাবাদী চেতনাপুষ্ট তারাশঙ্কর কংগ্রেসের নীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ব্যাপক-গভীর তাৎপর্যকে স্বাধীনভাবে অনুধাবনের পরিবর্তে মূলত দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে তিনি একাধিকবার উক্ত আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল্যায়ন হুবহু উদ্ধৃত করেছেন— যেখানে জনগণের ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহকে বিশৃঙ্খলা বলে অভিহিত করে তা থেকে নিরস্ত হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বারবার তিনি 'আগস্ট আন্দোলনে'র স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এবং ওই আন্দোলনের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানিক দলীয় দৃষ্টি দ্বারা নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকে মূল্যায়ন করেন নি। তিনি ছাত্র-জনতার বিদ্রোহ, সাহস ও শক্তিকে প্রকৃত শিল্পীর মেজাজ নিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। গণসংগ্রামের

বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে এর স্বরূপকেই তিনি ধরতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মানবমনের গভীর প্রদেশে সংগ্রামমুখর এই ব্যাপকতর বিক্ষোভ কী অভিঘাতের সৃষ্টি করল এবং তাতে সেখানে পরিবর্তনের কী কী চিহ্ন স্পষ্ট হলো— তা অঙ্কনেই মানিক অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশের পরিবর্তে সংগ্রামশীল মানুষের অন্তঃপ্রেরণাকে শিল্পদৃষ্টি দিয়ে যাচাইয়ের বিষয়টিই যেহেতু মানিকের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, সেহেতু 'আগস্ট আন্দোলন'সহ কোনো নির্দিষ্ট সংগ্রাম সীমা তাঁর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয় নি।

এর আরও একটি কারণ, 'আগস্ট আন্দোলনে'র সঙ্গে কেবল একটি দলের গৌরবই বিশেষভাবে জড়িত। ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশে 'ভারত ছাড়' শীর্ষক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অতঃপর ৭ আগস্ট সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশবাসীর প্রতি আন্দোলনের আহবান জানালে ৯ আগস্ট সরকার মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হয়। এর প্রতিবাদে সারা ভারত জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। সরকারও ব্যাপক গ্রেপ্তার ও দমন নীতি নিয়ে অগ্রসর হন। অতঃপর ১৯৪৪ সালে গান্ধী 'ভারত ছাড়' নীতি পরিত্যাগ করলে ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হন। ১৯৪২এর আগস্টে সংঘটিত এই আন্দোলন সম্পর্কেই *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসে গৌরবময় স্মৃতিচারণা আমরা একাধিকবার লক্ষ করি। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

> ক. বিয়াল্লিশ সালের কলকাতা এবং দেশেও অনেক তফাৎ ছিল, তখন তারা কাঁচা বয়সে— সেকালের কলকাতায় শুধু সবিস্ময়ে দেখেছে সেদিনের বিপ্লব মানুষকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে, দলে দলে মানুষকে জেলে যেতে দেখেছে; মহাত্মা গান্ধী থেকে সুভাষচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত, যাঁদের নাম শুনে তারা শুধু ভক্তি করত তাদের তারা প্রত্যক্ষ চিনেছে সেই সময়ে। (পৃ ১০)
>
> খ. এই তো সেবার— আগস্ট আন্দোলনে— এ পাড়ার বড়লোক, বড়লোকের ছেলে থেকে দোকানদার ওই যে মাখনের দোকান করে— সে পর্যন্ত জেলে গিয়েছিল, কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদি এরাও জেলে গিয়েছিল। ওই যে বুড়ো ডাক্তারবাবুর মেয়ে ইলা, সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই। সেইখানে তারা হাঙ্গামার মধ্যে ধরা পড়েছিল। (পৃ ৩১)
>
> গ. উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগস্ট আন্দোলন সে দেখেছে, সে

জানে আগস্ট আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' জানে সে— 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' তাও জানে সে; যুগান্তরের দরজায় তার ছবি সে দেখেছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে জানে— মৌলানা আজাদ— পণ্ডিতজীকে জানে। (পৃ ৩১)

এসব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, তারাশঙ্করের কাছে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন অপেক্ষা আগস্ট আন্দোলনই অধিকতর গৌরবদীপ্ত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আগস্ট আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকলেও তা ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক দলের আন্দোলন। অন্যদিকে ১৯৪৫এর নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস কিংবা ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারিতে রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে যে-সংগ্রামতরঙ্গ তা কোনো বিশেষ দলের নয় বরং প্রকৃতপক্ষেই ছিল জনগণের আন্দোলন। মানিক তাই মানুষের শক্তিকেই দেখেছেন; অথচ তারাশঙ্করের কাছে দলীয় আবেদনই হয়ে উঠেছে মুখ্য। আসলে ব্যক্তি ও সমাজমনে শোষণ-নিপীড়নজনিত যন্ত্রণা ও ক্ষোভের আগুন জমতে জমতে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার এমন ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে যে, প্রচলিত সমাজশৃঙ্খল বা রাষ্ট্রশৃঙ্খল তার উত্তাপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। গণবিদ্রোহের এই স্তরটি এমনই স্বয়ংক্রিয় যে, তা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশের অপেক্ষা করে না। ইতিহাসের এসব ক্রান্তিকালে ইতিহাস রচয়িতারাও কখনও কখনও হয়ে পড়েন অপ্রয়োজনীয়। সমাজদ্বন্দ্বের এই স্বরূপকে প্রকৃত ইতিহাসদৃষ্টি বা বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে মানিক যতটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারাশঙ্কর ততটা সমর্থ হন নি। এই সীমাবদ্ধতার কথা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন : "তারাশঙ্করের সম্বন্ধে এ-আপত্তি না উঠে পারে না যে, জীবনের দ্বন্দ্বসম্ভূত পুরাতনের যে ক্ষয় তার জন্য বিধুরতাকে তিনি যতটা প্রশ্রয় দেন, ততটা তার স্বরূপকে চিনতে চান না। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে যে-সামাজিক অগ্রগতির জন্ম হয়, এটাকে তারাশঙ্কর শুধু কথার কথা মনে করেন।"[৮]

তারাশঙ্করের মধ্যে দলীয় মনোভাবের প্রভাব উপন্যাসের সর্বত্রই স্পষ্ট। ১২-১৩ ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর সরকারপক্ষ যখন কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারিসহ সৈন্যতলব প্রভৃতির মাধ্যমে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে তখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগও জনগণকে শান্ত থাকার উপদেশ দেয়। উভয়ের এরূপ আচরণ থেকে মনে হয় : সরকারের নয়, সকল অপরাধ যেন জনতার। কংগ্রেস ও লীগের পতাকাবাহী গাড়ি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি লাউডস্পীকারে ঘোষণা করা হয় : "আপনারা রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে জনতার সৃষ্টি করবেন না। কোন প্রকার

হিংসাত্মক কাজ করবেন না, কাউকে করতে দেখলে তাকে বারণ করবেন- নিরস্ত করবেন তাকে।" (পৃ৪৪)। এই ঘোষণা শুনে আন্দোলনে সক্রিয় "কানু বসে পড়ল একটা দোকানের সিঁড়ির উপর। হতাশার অবসাদে সে যেন এক মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ল। চারিপাশে ফুটপাথ আজ প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।" (পৃ ৪৪)। রাস্তার লাইট পোস্টে সাঁটা পোস্টারের মাধ্যমে কলকাতার কংগ্রেস নেতৃত্ব নাগরিকদের প্রতি যে-আবেদন জানান, তাতেও একই সুরের প্রতিধ্বনি : "হিংসার পথে কেবল মর্মান্তিক এবং ব্যর্থ পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে পৌছিতে হয়- কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগুনের আক্রমণ আগুন জ্বালিয়া রোধ করা যায় না, আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জল ঢালিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অহিংস প্রতিরোধ।...অনর্থক খণ্ড আন্দোলনে শক্তিক্ষয়ে মূল স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইবে।" (পৃ ৪৯)। পোস্টারের লেখা পড়তে পড়তে কানুর মতোই গোপেনের প্রতিক্রিয়া : "আর পড়তে পারলে না গোপেন। সে সরে এসে দাঁড়াল ফুটপাথের উপর। হে ভগবান্! তার সামনে দিয়ে সশব্দে চলে গেল মিলিটারী লরি।" (পৃ ৪৯)

উভয় উদাহরণে আমরা লক্ষ করছি কংগ্রেসের শান্ত হওয়ার আবেদন সংগ্রামী জনতাকে করেছে দুঃখকাতর, হতাশাজর্জর। তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এই মনোভাব যে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়— তার চিত্র অঙ্কন করে তারাশঙ্কর রাজনীতিক হিসেবে নয় বরং শিল্পী হিসেবেই সততার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই সততা উপন্যাসের সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হলে তারাশঙ্কর অবশ্যই প্রশংসাভাজন হতেন। কিন্তু তা হয় নি। মানিকের ক্ষেত্রে আমরা যেটা লক্ষ করি- *চিহ্ন* উপন্যাসে সংগ্রামী ছাত্রদের প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের গৃহপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ বারবার প্রত্যাখ্যাত হয় এবং রাজপথের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হন। এবং আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তারাশঙ্কর সবশেষে ব্যর্থতাবোধে অবনতমস্তক শিথিলপেশি বিদ্রোহের এক ম্লানচিত্র পাঠককে উপহার দেন। তিনি বলেন : "বরেণ্য দেশনায়কের সতর্কবাণী নিষেধাজ্ঞায়, নিরস্ত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের শাসনে মানুষ বল হারিয়ে ফেলেছে, অভিভূত হয়ে শিথিল-পেশী হয়ে পড়েছে বিদ্রোহ।" (পৃ ৪৬)। জনগণের শক্তি সংগ্রামকে অশ্রদ্ধাভরে পদদলিত করেন যে-

নেতৃত্ব, তারা তারাশঙ্করের কাছে বরেণ্য দেশনায়কই থেকে যান। নেতৃত্বের সচেতন উপেক্ষায় সংগ্রামী জনতার হতাশার চিত্র অঙ্কন, আবার সেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রতিই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন— এ-এক তীব্র পরস্পরবিরোধিতা নিঃসন্দেহে। তারাশঙ্করের জীবনভাবনা ও রাজনীতিচিন্তার মধ্যেই এ-বৈপরীত্যের সমাহার। যেমন, জনতার রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সমঝোতাধর্মী সুবিধাবাদী মনোভাবকে আড়াল করার জন্য গণসংগ্রামের এমন এক আধ্যাত্মিক দর্শনমণ্ডিত ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করেন, যা তাঁর শিল্পিজীবনেরই এক বড়ো ধরনের অন্তঃঅসঙ্গতির নামান্তর হয়ে ওঠে :

> খবরের কাগজে হেড লাইন ছাপা হয়েছে— ঝড়ের পর শান্ত কলিকাতা।
> ঝড় বই কি! এ ঝড় নূতন নয়। মানুষের সমাজ গঠনের প্রারম্ভ থেকে এ ঝড় উঠছে। কখনও বড় —কখনও ছোট। শাসকের শাসন, বঞ্চকের বঞ্চনা—, উৎপীড়কের উৎপীড়ন—শৃঙ্খলিত, বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের চোখে যখন অশ্রু ঝরে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয় যত বিন্দু অশ্রু তত বিন্দু ক্ষোভ। উত্তাপ বাড়তে থাকে মাত্রায় মাত্রায়। তারপর একদিন অকস্মাৎ জাগে ঝড়। অতীতকালেও বারবার জেগেছে—একালেও জাগছে। শৃঙ্খলিত মানব-সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খলে তাতে ফাট ধরছে কিনা— কে জানে! মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে তাই, সে বিশ্বাস করে বন্ধনের গ্রন্থি একটার পর একটা কাটছে। সে বিশ্বাস যদি মিথ্যাও হয়। তবুও তার এতেই একমাত্র সান্ত্বনা। যুগব্যাপী দুঃখের পর এই পরম দুর্যোগের মধ্যেই পায় সে পরমানন্দের আস্বাদ। ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রত্যাশা করে থাকে—এর পর আসবে আবার বড় দুর্যোগ। তাই প্রলয়ের মধ্যে বৈষম্য অন্যায়-অধর্ম-পীড়িত পৃথিবীর শেষ এবং সত্যের ভিত্তিতে সুখ-শান্তি-ভরা নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনাই তার আদিম শ্রেষ্ঠ এবং সার্বজনীন পরিকল্পনা। সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গোপেন বার হল। (পৃ ৫০-৫১)

তারাশঙ্কর নিজ ভাবনাকে গোপেনের ওপর আরোপ করেছেন এখানে। আসলে গোপেনের নিজেকে আশ্বস্ত করা নয়, এ- যেন তারাশঙ্করের নিজের মনকেই নিজের প্রবোধ দেওয়া। শিল্পী ও রাজনীতিক হিসেবে তারাশঙ্করের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল তাকে এড়াতে গিয়ে তিনি নিজ শিল্পিসত্তার সঙ্গে এভাবে অবিচার করেন। বাস্তব পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজে না- পেয়ে মানুষ যেমন ধর্মের বর্ম পরে— তারাশঙ্করের মধ্যেও যেন তারই অনুরণন। আর সত্য সত্যই উপন্যাসে ভগবানের নিকট পরাভূত মানুষের নালিশ জানানোর মধ্যে আমরা তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তার ক্রন্দনই শুনতে পাই। উপন্যাসের সর্বত্রই ভগবান ও অদৃষ্টের ওপর নির্ভরতার কথা আমরা উচ্চারিত হতে দেখি। কয়েকটি উদাহরণ, যেমন :

> ক. সৈন্য-পুলিস কর্তৃক গুলি করে নিরীহ মানুষ হত্যার কথা উল্লেখ করে গোপেন বলে :

"সাধ মিটিয়ে মেরে নে। ভগবান আছেন।" (পৃ ৫)। বা, "ঢেলার বদলে গুলি। হে ভগবান্!" (পৃ ৫) অন্যত্র, "গোপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পর্শ করলে, হাতে থাকে একটা রূপোর তৈরি পলার আংটি, সেটা স্পর্শ করলে দুই ভুরূ ঠিক মাঝখানটিতে। তারপর হন–হন করে রওনা হল।" (পৃ ১২)। উপন্যাসের শেষে, কন্যার মৃত্যু সম্পর্কে গোপেনের প্রতিক্রিয়া : "নেবুর একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। গোপনে— অত্যন্ত গোপনে। কালীঘাটে গিয়ে করে আসবে। তার আত্মার শান্তি চাই– সদগতি চাই।" (পৃ ৫১)
খ. ঠিকে ঝি জগো মাসী ও তার দল কাজে যেতে ধাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর : "দল বেঁধে বসে তারা এখন অভিসম্পাত দিচ্ছে। ভগবানকে ডাকচে। বলছে বিচার করো তুমি।—" (পৃ ২০)
গ. নেবুর মরদেহের সদগতি সম্পর্কে ইসমাইলের উচ্চারণ : "দোস্ত, বিশ্বাস করো আমার কথা– খোদাতালার নাম নিয়ে আল্লা রসূলের নাম নিয়ে তোমাকে বলছি—" (পৃ ৪৫)
ঘ. কন্যা নেবুর মৃত্যু ও স্বামী গোপেনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর শান্তির ভাবনা : "নিষ্ঠুর অদৃষ্ট, তার দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগের আর অন্ত নেই; হে ভগবান!" (পৃ ৪৭) কিংবা, "ঘরের মধ্যে শান্তি আজ ভগবানকে ডাকছে। — হে ভগবান! এই করলে শেষে তুমি?" (পৃ ৪৮)

মানুষ যখন রাজপথে মৃত্যুপণ সংগ্রামে ব্যাপৃত— সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে নিরস্ত্র জনগণ— তখন মানুষের পেশিশক্তিকে প্রাধান্য না–দিয়ে বারবার ভগবান–প্রসঙ্গ টেনে–আনার একটাই অর্থ হতে পারে–শিল্পী হিসেবে তারাশঙ্কর জীবনের মহামূল্যকে স্বীকার করতে অপারগ। অথচ এক্ষেত্রে মানিক পুরোপুরিভাবে নিরাসক্ত, সংস্কারমুক্ত এবং জীবনের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম ও সৌন্দর্য চেতনাসূত্রে মানুষের যে–শ্রেষ্ঠত্ব যে–মহত্ত্ব তার প্রতি মানিকের আস্থা ছিল সর্বাধিক। জীবনের মহত্তম সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর শিল্পিহৃদয় দিয়ে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন বলেই সংগ্রামশীল মানুষের মধ্যে সকল সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছেন। আর সে–কারণেই সংগ্রামী অনুপ্রেরণাদীপ্ত জীবনকে তিনি কখনও খাটো বা দুর্বল করে আঁকতে পারেন নি। মৃত্যু–মুহূর্তেও *চিহ্ন* উপন্যাসের গণেশ তাই ভগবানকে স্মরণ করার পরিবর্তে অবস্থানরত ছাত্রমিছিল অগ্রসর হবে কিনা— সেই প্রশ্ন রেখে যায়। ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে কলেজছাত্র রসুল অদৃষ্টকে দায়ী না–করে এক হাত দিয়ে সাইকেল চালনাসহ সকল কাজ কিভাবে রপ্ত করবে— সেই কথা ভাবে। একমাত্র পুত্রকে হারিয়েও শ্রমিক ওসমান পুত্রবন্ধুদের মধ্যে নিজপুত্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। অর্থাৎ একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখবোধকে নির্বিশেষ করে দিয়ে এভাবে দুঃখের উত্তাপকে মানিক নিঃসন্দেহে হ্রাস করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে তাঁর বাস্তবতাবোধের উৎকর্ষও পরিস্ফুটিত হয়েছে। তারাশঙ্করের মধ্যে এরূপ সচেতনতার অভাব আমরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ করি। বাস্তবজগতের যন্ত্রণা থেকে

উপশম লাভের জন্য চরিত্রসমূহকে ঈশ্বর ও অদৃষ্ট নির্ভর করে তোলা একজন শিল্পীর পক্ষে কখনও প্রশংসার বিষয় হতে পারে না। বরং এ তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দীনতারই বহিঃপ্রকাশ।

৬. এ-প্রবন্ধ পড়ে কারও মনে যেন এমন ধারণা না-জন্মায় যে, তারাশঙ্কর অপেক্ষা মানিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য। কোনোভাবেই তা নয়। প্রায় একই পটভূমি অবলম্বন করে নতুন আঙ্গিকরীতির দ্বারস্থ হয়ে সমসাময়িককালে রচিত দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক শিল্পসার্থকতা বিচার করতে গিয়ে রচয়িতাদের শক্তি ও দুর্বলতার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে— এ কথা ঠিক। কিন্তু তা ওই দুটি উপন্যাস প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। বড় জোর বলা যায়, এই দুই ঔপন্যাসিকের রাজনীতি-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে উপন্যাস দুটি প্রতিনিধিস্থানীয়। তাঁদের সামগ্রিক মূল্যায়ন, অবশ্যই, এ দুটি উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবপর নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের শিল্পসফলতা অনন্য। বিশেষত, গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত, এবং আঞ্চলিক, উপন্যাসসমূহে— যেখানে তিনি সামন্তজীবনের ক্ষয়িষ্ণু রূপের মধ্যে নতুন কালের স্পন্দনকে চিত্রিত করেছেন— যা শিল্পসিদ্ধিতে হয়ে উঠেছে তুলনারহিত। আসলে প্রায় প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব কিছু ক্ষেত্র থাকে যেখানে তাঁর বিচরণ হয় স্বচ্ছন্দ— তার বাইরে তিনি হোঁচট খান। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এ-বক্তব্য প্রাসঙ্গিক, এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে, *ঝড় ও ঝরাপাতা* তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন : "'১৩৫০' 'মন্বন্তর', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসে তিনি স্বক্ষেত্র খুঁজে পান নি। তাঁর স্বক্ষেত্র ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী, আর সে অভিজ্ঞতায় কোনো ফাঁক বা ত্রুটি নেই।"[৯]

তারাশঙ্করের শিল্পিজীবনের এই পটভূমির সঙ্গে তাঁর নিজ শ্রেণীসীমাও একীভূত হয়ে আছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে তার আভিজাত্য ও দীর্ঘশ্বাসকে তিনি আজীবন বুকে ধারণ করেছেন— যা তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শপুষ্ট রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে কখনও বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে মানিক ছিলেন একান্তভাবেই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিভূ। মধ্যবিত্ত জীবনস্তরের অবক্ষয় ও সম্ভাবনা— এ-দুটোকেই তিনি সমানভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পিভাবনা ও মধ্যবিত্ত চেতনার সঙ্গে পরিপূরক হয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর সমাজবাদী রাজনৈতিক বোধ। সন্দেহ নেই, এই শ্রেণীসীমা

তিরিশোত্তরকালের দুই মহৎ ঔপন্যাসিক— তারাশঙ্কর ও মানিকের— শিল্পসাতন্ত্র্যের ভিত্তিও বটে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[এ-প্রবন্ধে ব্যবহৃত *ঝড়* ও *ঝরাপাতা* উপন্যাসের উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* অষ্টম খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৯২, কলকাতা) থেকে এবং ১৯৪৫এর নভেম্বর ও ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের তথ্যাবলি উল্লেখিত হয়েছে অমলেন্দু সেনগুপ্তের *উত্তাল চল্লিশ-অসমাপ্ত বিপ্লব* (কলকাতা : ১৯৮৯) গ্রন্থ থেকে]

১ একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হলো, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *ঝড়* ও *ঝরাপাতা* উপন্যাসকে পরবর্তীকালে 'কালবৈশাখী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন; প্রকাশকাল : জুন ১৯৬৩। দ্র. *তারাশঙ্কর-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, দ্বি-মু· ১৩৯২, কলকাতা, গ্রন্থ-পরিচয় অংশ, পৃ ৩১৯

২ চিহ্ন উপন্যাসের পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্নজনের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

ক· গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসের ভূমিকায় মানিক নিজেই বলেন : "চিহ্ন বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।" *(দ্র· মানিক বিচিত্রা*, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা : ১৯৭১, পৃ ৩১; কিংবা, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, সরোজমোহন মিত্র, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ ৬৮)

খ· "গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।" *(মানিক গ্রন্থাবলী* ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, বিশেষ সং ১৯৭৪, গ্রন্থ-পরিচয় অংশ, পৃ ৬৫৩)

গ· "গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে (মাঘ ১৩৭৮) "চিহ্ন"-র পরিচয় লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে যে উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। তাহ'লে উপন্যাসটিকে মাঘ ১৩৫২ থেকে পৌষ ১৩৫৩-র মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ হ'তে হয়। ঐ সময়ের মধ্যে "মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত ধারাবাহিক লেখাগুলির মধ্যে "চিহ্ন" নেই।" *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, জলার্ক, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ ৯৩-৯৪-এ বক্তব্য সরোজ দত্তের)

ঘ· "১৯৪৬এ রসিদ আলি দিবসের প্রেক্ষাপটে ঐ বছরের 'বসুমতী'র নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় চিহ্ন *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, জলার্ক, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ ১৩০-এ বক্তব্য মালিনী ভট্টাচার্যের)

৩ দ্র. উত্তাল চল্লিশ-অসমাপ্ত বিপ্লব, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, কলকাতা : ১৯৮৯, পৃ ৭২

৪ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৪, পৃ ৫৭২

৫ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ ১৩-১৪

৬ *তরী হতে তীর*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ ৫০২

৭ *কালের প্রতিমা*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১, পৃ ১১

৮ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৮

৯ *কালের প্রতিমা*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬